'মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরুত্তর' জগদীশ গুপ্ত

অশ্রুকুমার সিকদার

আমাদের দেশে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত প্রবাহিত মানবতন্ত্রী সাহিত্যধারা আমরা অনেকটা পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছি। রেনেসাঁসের জীবন-দর্শন অনুসারে একক মানুষের অনন্য মানুষে উন্মেষিত হয়ে ওঠাতেই ব্যক্তির সার্থকতা। অনন্য মানুষ সৃজনশীলতার অধিকারী এবং অফুরন্ত সম্ভাবনার আধার। আর মানবজাতির ইতিহাস আসলে সভ্যতার ক্রমাগত উন্নতির ও মানুষের অনর্গল সৃজনশীলতারই ইতিহাস। মানবতন্ত্রের নায়ক যে ধীমান মানুষ সে নিজেই নিজের নিয়তির নিয়ামক। আর এই সংসারে যাবতীয় মূল্যবোধের মানদণ্ড ও বিচারক মানুষ নিজেই। এই মানবনতন্ত্রী প্রত্যয়কে শিরোধার্য করে রেনেসাঁসের উত্তরকালে মহৎ পাশ্চাত্য সাহিত্য রচিত হয়েছিল, যে ধারা ইউরোপে হারিয়ে গেল উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের গোড়ায়। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রে নিষ্ঠাবান রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সংকট' বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি— পিছনের ঘটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবো।' কথাটার মধ্যে একটা মরিয়া ভাব আছে, যেন দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছেন কবি। পরবর্তীকালে অনেক সময় মানবতন্ত্রে ততোটুকু আস্থাও বজায় রাখতে পারে নি, অনেক সময়েই উত্তরকাল মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরত্তর'। কেন নিরুত্তর? কারণ এমন এক সময়ের বাসিন্দা আমরা যখন 'যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি... শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়!'

ইউরোপে পোস্ট রেনেসাঁস অ-মানবতন্ত্রী সাহিত্যের পত্তন হয়তো ডস্টয়েভস্কি এবং বোদলেয়ারের রচনায়। এই অমানবতন্ত্রী সাহিত্য ঐতিহ্যবিরোধী, অসামাজিক; তার জগৎ হতাশাময় অন্ধকারে বদ্ধমূল, পচনশীলতা আর বন্ধ্যাত্ব তার স্বধর্ম। বিবমিষা ও নির্বেদ সেই জগৎকে আচ্ছন্ন করেছে। তার পথপ্রান্তর অসুস্থ, মানসিকভাবে পঙ্গু মানুষে আকীর্ণ। মানুষেরা সেখনে নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন, প্রবাসী। নায়ক এখন আর কর্তা বা হীরো নয়, সে অ্যান্টিহীরো। সেই নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন মানুষেরা নির্বেদ ও নিরর্থকতার বোঝা বইতে না পেরে প্রায়ই আত্মহননের পথ বেছে নেয়— 'the vacant into the vacant'। লুময়েঁর

প্রস্তাবিত আত্মহত্যা প্রসঙ্গে *Lost Illusions* উপন্যাসে বালজাক মন্তব্য করেছিলেন, 'When we consider the seriousness of the question it is surprising that so little has been written about suicide, and that so little attention has been paid to it.' ডস্টয়েভস্কির পরের কালের অ-মানবতন্ত্রী সাহিত্য সম্বন্ধে একথা আর বলা চলে না। জীবনানন্দের 'আটবছর আগের একদিন'-এর নায়ক ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাদের পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি এদেশে-বিদেশে অনেক আছে। এই আত্মহননের পৌনঃপুন্য প্রমাণ করে রেনেসাঁসের মানবতাবাদে শিল্পীর অনাস্থা। রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রী সাহিত্য আজ অবস্থাবৈগুণ্যে পর্যবসিত হয়েছে উত্তর-রেনেসাঁস অ-মানবতন্ত্রী সাহিত্যে।

অন্য একটা উদাহরণ থেকে এই পরিবর্তনের মৌলিকতা প্রমাণ করা যায়। রেনেসাঁসের পর থেকে পশ্চিমীসাহিত্যে প্লেটোর অনুকরণে অনেক ইউটোপিয়া বা কল্পরাজ্যের বিবরণ দেখা হয়েছে। টমাস মোরের *Utopia.* বেকনের *New Atlantis,* কাম্পানেলার *City of the Sun,* ভোলতেয়ারের *Candide,* দ্য বরজেরাকের *The Other World*। এই সব কাল্পনিক প্রজাতন্ত্র রচনার প্রধান প্রেরণা ছিল মানবতন্ত্রে অটুট আস্থা। রচয়িতারা ভেবেছিলেন, যুক্তিবাদী মানুষের ক্রমান্বয় প্রগতি ঘটবে, তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উত্তরোত্তর বিকাশ হবে, স্বর্ণযুগ আসবে। তাঁরা সেই আসন্ন স্বর্গরাজ্যের মানচিত্র রচনা করেছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে এই নিরঙ্কুশ আশাবাদের অবসান ঘটেছে— এখন অনুভূতিপ্রবণ মানুষ 'অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে/যতো না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে'। মানবসভ্যতার ভবিষ্যতের দিকে তাকালে শিল্পী আজ কোনো সুদিনের সম্ভাবনা দেখেন না, বরং তাঁর মনে হয় আরো ভয়ংকর দুর্দিন আগতপ্রায়। তাই তাঁদের হাতে রচিত হয়ে যায়, যাকে বলা যেতে পারে উল্টো-ইউটোপিয়া— বাটলারের *Erewhon.* অল্ডস হাক্সলির *Brave New World,* অরওয়েলের *1984,* চেক লেখক চাপেলের *R.U.R* এবং রুশ লেখক জামিয়াটিনের *We*।

এই ধারার লেখক বাংলায় বিরলদৃষ্ট। পোস্ট-রেনেসাঁস অ-মানবতন্ত্রী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য যাঁর রচনায় সবচেয়ে বেশি প্রকট তিনি 'অনুপস্থিতি' লেখক জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। মানুষ সম্বন্ধে তাঁর রচনায় যে তীব্র অনাস্থা, তার মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ, ও তাঁর সম্বন্ধে সাম্প্রতিক উৎসাহের উৎস। কিন্তু তিনি যে অ-মানবতন্ত্রী সাহিত্য রচনা করেছেন, সে কোনো পশ্চিমী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়। তাঁর স্বকীয় জীবনোপলব্ধির দরুণই তিনি এই তিক্ততাময় রচনাগুলি লিখতে পেরেছিলেন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্রের যৌথ প্রয়াসে যে সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছিল, সেই আব-হাওয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সার্থক শিল্পী-প্রতিবাদ জগদীশ গুপ্তের।' প্রতিবাদ এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাহিত্য যেখানে

মানুষের উপর অপরিসীম বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, সেখানে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যের মূল কথাই হলো মানুষের মনুষ্যত্বে অবিশ্বাস। প্রভাতকুমারের *রত্নদীপ* উপন্যাসের সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের *অসাধু সিদ্ধার্থ* এবং রবীন্দ্রনাথের *যোগাযোগ*-এর সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের *গতিহারা জাহ্নবীর* যে তুলনা করেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাতেই মূলধারার সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে যায়। 'প্রভাতকুমার শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যে লালিত বাঙালি পাঠক জানে পাপী আসলে পাপী নয়, চরিত্রহীন চরিত্রহীন নয়, পতিতারও সতীলক্ষ্মীর মতো পাপপুণ্যবোধ।' কিন্তু 'জগদীশ গুপ্ত আগাগোড়া তিক্ত, রুক্ষ ও নৈরাশ্যবাদী। তাঁর লেখা পড়লে আমাদের মূল্যবোধগুলি প্রচণ্ডভাবে নাড়া খায় এবং আমরা স্বভাবতই অস্বস্তিবোধ করি।' *লঘু-গুরু* উপন্যাসের রবীন্দ্রনাথ-কৃত সমালোচনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই তীব্র অস্বস্তিবোধ। এই উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর প্রধান আপত্তি দুটি— প্রথম, উপন্যাসে বর্ণিত লোকযাত্রা তাঁর অচেনা; দ্বিতীয়, বেশ্যাকে ঘরে এনে বসবাস করায় সমাজের অচাঞ্চল্য ও পরিতোষের মতো 'কোমর-বাঁধা শয়তান' চরিত্রের পরিকল্পনা অবাস্তব। কিন্তু সমালোচনাটি পড়লে বোঝা যায়, মানুষের যে ইতরতা-নীচতা বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটিতে এবং তার মধ্য দিয়ে মানুষ সম্পর্কে যে অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে তাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রগাঢ়ভাবে অস্বস্তিবোধ করেছেন। আমি বলতে চাই, মানুষ 'একটি দুর্নিরীক্ষ্য আর অতিহিংস্র শক্তির হাতে অশক্ত ক্রীড়নক' (অনিলবরণ রায়), বা 'দুর্জ্ঞেয় অদৃষ্ট' (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), মানুষকে চালিত করে, 'তাদের অস্তিত্ব প্রকাণ্ডভাবে দেহসর্বস্ব' (সুবীর রায়চৌধুরী), অথবা 'মানুষের জীবনে একটা অতিশয় দয়াহীন ও দুজ্ঞেয় দৈবনির্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে' (মোহিতলাল)— এগুলি দেখানোই জগদীশচন্দ্রের রচনার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। তিনি দেখিয়েছেন মানুষের স্বভাবের দৈন্য কুশ্রীতা নোংরামি, দেখিয়েছেন জীবনের অন্তর্নিহিত শুদ্ধিভবনের শক্তি বারে-বারে মানুষের অমানুষিক নীচতা ও ইতরতার কাছে কীভাবে পরাভব মানে। মানুষ সম্বন্ধে এক গভীর অশ্রদ্ধাই তাঁর রচনার প্রধান লক্ষণ। মানুষের মহিমা নয়, মানুষের মহিমাহীনতাই তাঁর বিষয়।

রোমন্থন উপন্যাসে তিন ভাই স্বগ্রামে বেড়াতে এসে দেখলো নিদারুণ দারিদ্র্য ও মানুষের অপরিসীম নীচতা। বিসর্জনের পর সুগঠিত বহুবর্ণা প্রতিমাকে জলের উপর টেনে তুললে তার শ্রীময়ী ভাবমূর্তি যেমন শ্রীহীন হয়ে যায় গ্রাম সম্বন্ধে তেমনি তাদের মোহমুক্তি ঘটে গেল। পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ আসলে কুচক্রী, মিথ্যা মামলার সাক্ষী। আবার তাকে প্রণামী হিসেবে বাবুরা কালোশশীর হাতে যে টাকা দেয় সে টাকা নিঃশব্দে আত্মসাৎ করতে কালোশশীর বাধে না। *দুলালের দোলা*-র নায়ক ও স্বগ্রামে বেড়াতে এসেছিল। গাঁয়ের নাম কেন পোড়া বউ তা জানতে চেয়ে সে শোনে এক বীভৎস ইতরতার গল্প। স্বামী ভারত কাজের মেয়ে স্বর্ণর প্রতি আসক্ত প্রমাণ পেয়ে গেল পোড়া-বউ। উপন্যাসের দ্বিতীয়াংশের প্রধান চরিত্র সতীশ স্বর্ণর সেই অবৈধ সন্তানের পুত্র। সতীশ স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করতো—

তার 'মনে হয় পিতামহী যার অসতী, তার স্ত্রী সতী হবে কেমন করে!' মেয়েকেও সে স্বভাবত সন্দেহ করে। রাত্রে শোনা যায় প্রহৃতা মেয়ের আর্তনাদ— 'কন্যাকে কন্যা বলিয়া জ্ঞান তার নাই... সে প্রহার করিতেছে নারীকে।' পিতামহের ধর্মভাইয়ের পৌত্র মনীশ রায়ের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে নায়ক নীরদ অবাক হয়। গলা জড়িয়ে অভ্যর্থনা, অচিরেই তুই-তুই সম্ভাষণ, জন্মসাল বলতে না পারায় চিবুক নাড়িয়ে দেওয়া, রুচিহীন গান, ইয়ারদের অশ্লীল রসিকতা— সব মিলিয়ে এক বিবমিষাময় পরিবেশ। অব্রাহ্মণ বলে নায়ককে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসতে দেওয়া হয় না। আরো আশ্চর্য, তাকে বলা হয় খাওয়ার শেষে বাসন মেজে দিতে; বিশেষত এই কারণে যে, তাসক্রীড়ারত ইয়ারদের একজন চোর। বাইরে এঁটো বাসন পড়ে থাকলেই সে চুরি করে গোয়ালন্দর হোটেলে বেচে দেবে। এই গ্রন্থের পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে পশুপতি ভট্টাচার্য বিশেষ করে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে বাসন-মেজে দিতে বলার কথা উল্লেখ করে জানতে চেয়েছেন, 'কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,— এসব ঘটনা কি সত্য বা সম্ভাব্য বলে মেনে নিতে হবে?' আগে দেখিয়েছি, *লঘু-গুরু*-র সমালোচনাতেও রবীন্দ্রনাথ এই বাস্তবতা বা সম্ভাব্যতার প্রশ্ন তুলেছিলেন। মনে হয় বাস্তবতার সমস্যাটা জগদীশচন্দ্রের কাছে ততো জরুরি ছিল না, তাঁর কাছে অনেক বেশি জরুরি ছিল মানুষের সহজাত ইতরতার রূপায়ণ। তার রূপায়ণে তিনি বাস্তবতা-সম্ভাব্যতার সীমাকে অতিক্রম করতেও রাজি ছিলেন। সতীশ মনীশকেও বদ্ধ অবস্থার প্রহার করে, তার সন্দেহ মনীশ তার মেয়েকে নষ্ট করছে। অথচ গতরাত্রে যে সতীশ তাকে মেরেছে তার গলা জড়িয়ে মনীশ নিজের জন্য আজ পাত্রী দেখতে যাচ্ছে যেহেতু সতীশ চালাক-চতুর লোক বলে পরিচিত। তাতে মনীশের কোনো ঘেন্নালজ্জা নেই। দ্বারিক ঠাকুর নীরদকে নিমন্ত্রণ করেছিল, কিন্তু ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িতে ভোজনের তিক্তস্মৃতি তার মনে জাগরূক ছিল বলে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেনি। তার শাস্তি দেয় দ্বারিক ঠাকুর সিঁদ কাটিয়ে নায়ক নীরদের জিনিস চুরি করিয়ে। চোরের ভাণ্ডারী সে—দুশো সিঁদের চোর তার হাতে। *যথাক্রমে* উপন্যাসে বাবার মৃত্যুর পর দীনবন্ধু ক্রমেই আবিষ্কার করে মানুষের নীচতা। শ্রাদ্ধের আসরে পুরোহিত অশ্রদ্ধেয় আচরণ করে, পুরোনো খদ্দেররা তাকে ঠকায়। দীনবন্ধু বুঝে যায় মানুষ বড় অসরল। নিত্যপদ ডাক্তারও পদে-পদে মানুষের স্বভাবের বক্রতার পরিচয় পাত্র। ডাক্তারের প্রাপ্য দুইটাকা বাঁচাতে মতিলাল যে পরিমাণে মাথা ঘটায় তাতে নিত্যপদ আশ্চর্য হয়। বিয়ের পর দীনবন্ধুর বোন সাবিত্রী শাশুড়ির মর্মভেদী বাক্যবাণ ও অত্যাচারে, গৃহস্থালির কাজের চাপের প্রচণ্ডতার স্বামীর উদাসীন নিরপেক্ষতায় ও অত্যাচারে, দেবরদের পরিহাসচ্ছলে অত্যাচারে, শরীরের প্রাণের সব গন্দ হারিয়ে ফেলে। হাসতে তার ভয় করে— হাসলে সে ফাজিল, না হসেল বিষমুখী। এইভাবে সরল স্বভাবা সাবিত্রী প্রাণের দায়ে হয়ে ওঠে কুঁদুলি। নেমে যায় পারিপার্শ্বিক নীচতায়।

মানুষের নীচতা, বিশেষ করে পুরুষের নীচতা, তীব্রভাবে প্রকট হয়ে ওঠে নরনারীর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। *নন্দ আর কৃষ্ণা* উপন্যাসের নন্দ মণীন্দ্রবাবুর প্রথম পক্ষের ছেলের গৃহশিক্ষক। মণীন্দ্রবাবুর রক্ষিতা, নন্দ যাকে মনীন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বলেই জানে, সেই কৃষ্ণাকে সে একদিন দেখে ফেললো সুবৃহৎ দর্পণের সামনে অর্ধনগ্ন অবস্থায়। সে মনে করতো সুন্দরী পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপ হবার ইতরতা তার নেই, কিন্তু এই আকস্মিক ঘটনায় তার মনে 'রূপসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষার একটি স্রোত নিরন্তর বহিতেই লাগিল।' নন্দ তার স্ত্রী মমতার কথা ভাবতে চেষ্টা করে, তার চিঠি পেয়ে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু মনে মনে সে চরম বিশ্বাসঘাতক। শুয়ে-শুয়ে সিঁড়িতে মৃদু পায়ের শব্দ শুনে তার মনে হয় তিনিই আসিতেছেন— উর্বশী, চিরযৌবনা উর্বশী জগতের মনোমন্দিরবাসিনী চিরবঞ্চিতা অনুপমা উর্বশী অভিসারে বেরিয়ে তার ঘরে আসতে উদ্যত। *দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা* উপন্যাসে মল্লিকার শাশুড়ি কামিনী নাতি চায়। ফলে অসুস্থ শরীরে মল্লিকা সন্তানসম্ভবা হলে কামিনীর কাছে তার আদর বেড়ে যায়। কামিনী মল্লিকাকে গর্ভবতী অবস্থায়ও তার মায়ের কাছে পাঠাতে নারাজ, কারণ 'সে চাইবে নিজের মেয়েকে, আমি চাই তার পেটের ছেলে। অর্থাৎ গর্ভিণীকে বলি দিয়া সন্তানকে বাঁচাইতে সে দ্বিধা করিবে না।' অকালে মৃতপুত্র জন্ম দিতেই মল্লিকার প্রতি রুষ্ট কামিনী। মল্লিকার মা দক্ষবালা তাকে পিত্রালয়ে নিয়ে যায়। স্বামী ভূবনেশ্বর পরে তাকে আনতে গেল মা-মেয়েতে মিথ্যে অপবাদ দেয়। গাঁয়ের মুরুব্বি দয়ানন্দ প্রভৃতির কথায় ভুবনেশ্বরের দ্বিতীয় বিবাহের কথা ওঠে— 'ভুবনেশ্বরের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, স্ত্রীর অভাবে তার পুণ্যকর্ম ও ধর্মসঞ্চার ব্যাহত হইতেছে।' দয়ানন্দকে নিয়ে ভুবনেশ্বর দ্বিতীয়বার শ্বশুরালয়ে গিয়েও প্রত্যাখ্যাত হলে দাম্পত্যস্বত্ব সাব্যস্তপূর্বক স্ত্রী দখলের মামলা করলো ভুবনেশ্বর। আদালতের বর্ণনায় জগদীশ গুপ্ত মানুষের লালসা, লোলুপতা ও অপ কৌতূহলের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক বিবরণ দিয়েছেন সংক্ষিপ্ত শাণিত ভাষায়। এই বিরল মামলায় লোকের কৌতূহল খুব— 'আদালতে লোক ধরিতেছে না— রঙ্গ দেখিতে কাজের ভিতরেই ফুরসৎ করিয়া লইয়া নিঃস্বার্থ লোক ঢের আসিয়াছে।' 'জানাজানি হইয়া গেছে যে, বিবাদিনীর বয়স কুড়ির বেশি নয়— একটিমাত্র সন্তান তার হইয়াছিল, এবং বর্ণ উজ্জ্বল। সুতরাং সে আসিতেছে শুনিয়া দর্শকগণের ভিতর একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল...।' এবং স্বামীর ঘরে মল্লিকা আর যেতে চায় না শুনে 'দর্শকবৃন্দের ভিতর দণ্ডায়মান গুপী মুন্সীর মনে হইল, তার ঘরে ঠাঁই ঢের আছে।'

নিদ্রিত কুম্ভকর্ণে-র নায়ক শশধর শরীরচর্চা করে অসীম বলশালী। ষাঁড়ের হাত থেকে বিপন্ন পথিককে রক্ষা করায় লোকে তার গুণমুগ্ধ। তার স্ত্রী প্রফুল্ল নিজেকে ভীমের স্ত্রী বলে গর্ব অনুভব করে। এক রাত্রে দরিদ্র প্রতিবেশী নকুলের বাড়িতে ডাকাত পড়লো। 'একটি নারীকণ্ঠের আর্তনাদ কানে আসিল— আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করিয়া, জ্যোৎস্নালোক অমর তুহিনপুঞ্জে আবৃত করিয়া, জীবনের জাগৃতিকে শিহরিত করিয়া এবং বোধহয় অন্তরের

দেবতাকে বিদ্ধ করিয়া সে শব্দ উত্থিত হইল এবং মিলাইয়া গেল... তারপর গুরুভার দ্রব্যপতনের শব্দ হইল; গুরুতর দ্রব্যটি বোধহয় মনুষ্যদেহ... এবং তারপরই একটা পুরুষকণ্ঠ চীৎকার করিয়াই গোঙাইতে গোঙাইতে নিঃশব্দ হইয়া গেল...।' প্রফুল্ল বারবার এই সব শব্দের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেও শশধর বিছানা ছেড়ে উঠলো না। পরদিন যখন জনতার মধ্যে একজন প্রশ্ন করে 'শশধরবাবু কিছু টের পান নি?' তখন শশধরের কর্ণমূল লাল হয়— কারণ জিজ্ঞাসার নিহিত ইঙ্গিত এই যে শশধর টের পেলে নারী হরণের এই ব্যাপার ঘটতে পারতো না। কিন্তু স্ত্রীর কাছে তার কাপুরুষতা গোপন নেই। প্রফুল্ল কষ্টে ছটফট করে আর শশধরকে বলে মেয়েটির 'সর্বনাশের জন্য দায়ী তুমি— তুমি পাপী।' ঘৃণায় লজ্জায় সে মাটিতে মিশে যেতে চায়। 'মানুষের অস্তিত্ব কেবল তার হাতের পায়ের গতরের নড়াচড়ায় জানা যায় আর মনে থাকে ভেবেছ! অমন নড়া ভূতেরাও নড়ে, জানোয়ারেরাও নড়ে— সম্ভ্রমবোধ কতটা এই মানুষের অস্তিত্বের পরিচয়— তা তোমার নেই, আর তোমার জন্যেই মানুষের তা নষ্ট হয়েছে। তোমার অস্তিত্বই আমি দেখছি নে।' *তাতল সৈকতে* উপন্যাসে শরতের কাহিনি আছে, যে শরতের সুখী দাম্পত্য জীবন ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর একদিন শরৎ যখন ছেলে শান্তর জন্যে অন্ধকারে পথে অপেক্ষারত তখন তাকে স্বৈরিণী ভেবে মত্ত অবস্থায় সম্ভাষণ করেছিল মনোহর দত্ত। ফলে মনোহর দত্তকে লোহার বাড়ি মেরে বসেছিল শরৎ। আঘাত গুরুতর না হওয়ায় হৈচৈ থেমে গেল। কিন্তু কথাটা প্রচ্ছন্নভাবে উঠলো, অন্য কাউকে নয়, শরৎকেই কেন স্বৈরিণী ভেবেছিল মনোহর। মনোহরের রক্ষিতা সুখী নাপতেনীর কাছে যখন খবর পৌঁছুলো তার বাবু শরতের রূপে মজেছে, তখন শরতের বাড়ি গিয়ে নিজেকে 'মনোহরের মেয়েমানুষ' বলে পরিচয় দিয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে এলো সুখী নাপতেনী। ফলে ঘরে থাকা হলো না শরতের, শান্তকে নিয়ে গৃহত্যাগ করলো সে। পথে পরিচয় হলো গুরুগৃহ পলাতক রণজিতের সঙ্গে। রণজিৎ তাকে মাতৃসম্মানে স্বগ্রামে নিয়ে এলো। রণজিৎ মা বলে ডাকায় যে সরল সুন্দর একটা অনুভূতি শরতের জীবনে এসেছিল তা কিন্তু স্থায়ী হলো না। প্রতিবেশীদের চোখে মুখে অপকৌতূহল উগ্র হয়ে উঠলো। রণজিতের মনে হলো, 'এই পূজনীয় ব্যক্তিগণ অন্ধকারে সুতীক্ষ্ণ শ্যেনদৃষ্টি হানিয়া বেড়াইতেছেন— হিংস্র জন্তুর শিকার সন্ধানের মতো... এতো ইতর ইহারা যে, ইতর আচরণের চক্ষুলজ্জাটা পর্যন্ত ইহাদের সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেছে।' যখন-তখন রণজিতের কুশল সংবাদ নিতে তার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ানো যেন লোকের বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। রণজিৎ সদ্‌গোপ মেয়ে শরতের হাতে খাচ্ছে শুনে গাঁয়ে জটলা পাকানো হয়, অথচ যে-মেয়ে প্রথম এই খবরটা দেয়, সকলেই জানে, তার বাবা এক সদ্‌গোপ মেয়ের সঙ্গে দীর্ঘকাল সহবাস করেছে। পঞ্চায়েত বসলে পঞ্চায়েতকে জানানোর জন্যে রণজিৎ জানতে চায়, তার মা কেন গৃহত্যাগ করেছিল। জানানো আর হয় না কারণ ইতিমধ্যে শরতের আদি গ্রামের রমাবৈষ্ণবী ভিক্ষার জন্য দ্বারে এসে দাঁড়ায়।

শরতের দিকে তাকিয়ে 'অলকাতিলকাধারিণী কৃষ্ণকায়া মাংসলদেহা রমা-বোষ্টমী যেন কেমন করিয়া হাসিতে লাগিল— সে বড় শক্ত হাসি।' বৈষ্ণবী গিয়ে ধনীগৃহিণী রাজনন্দিনীকে শরতের গল্প বলে; বলে, মনোহরের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল, দামে বনে নি বলে সে মনোহরকে মারে। সদলবলে রাজনন্দিনী এসে সেই সব কথার পুনরাবৃত্তি করায় সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে রণজিৎ। আত্মহত্যা ছাড়া পথ রইলো না শরতের, জয় হলো সর্বব্যাপী ইতরতার।

মধুভাঙার মেলায় দেড়বছর আগে ফূর্তি করতে গিয়ে দুই বন্ধুসহ সাতকড়ি একটি অভিভাবকহীন মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার হয়। আজ দেড় বছর পরে ছাড়া পেয়ে সে বাড়ি ফিরবে। এই নিয়ে লেখা কলঙ্কিত *সম্পর্ক* গল্প। সাতকড়ির স্ত্রী মাখনবালা ভয়ে ভয়ে দিন গুণছিল স্বামীর আগমনের। তার জীবন্মৃত শুষ্ক প্রাণ যেন কণ্ঠাগত। 'ঐ হলাহল তাহাকে পান করিতেই হইবে— নিস্তার নাই।'— ভেবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল মাখন। সাতকড়ি অবশ্য দিনের আলোয় বাড়ি ফেরে না। কিন্তু সারা দিন বধূর বিষণ্ণ মুখ দেখে পুত্রস্নেহে অন্ধ শাশুড়ি বিরজার পিত্ত জ্বলে যায়। সন্ধ্যার পর আপাদমস্তক কাপড়ে ঢেকে সাতকড়ি গৃহপ্রবেশ করলে বাড়িতে হৈচৈ পড়ে যায়— চক্ষুলজ্জাহীন বিরজার গৃহপ্রত্যাগত পুত্রের জন্য স্নেহ উথলে ওঠে। তার স্থূল স্বভাবে মাখনবালার পরিস্থিতি বোঝার কল্পনাশক্তি নেই। সে মাখনকে বলে, 'নেচে বেড়াতে তোমায় কেউ বলছে না। ছেলের সামনে তুমি মুখ অমন বিষ করে থাকতে পাবে না।' মাখনের অবস্থা খানিকটা বোঝে বড়জা গোলাপ। আর সাতকড়ির উচ্ছিষ্ট ভোজনপাতে ছোট বউ ভাত লয় নাই দেখিয়া, অর্থাৎ স্বামীর প্রতি বধূর এই ঘৃণা প্রকাশে, বধূর প্রতি দারুণ অপ্রবৃত্তি জন্মিয়া বিরাজের যে কেমন ঠেকিতে লাগিল তাহা বলা যায় না।' শয়নকক্ষে স্ত্রীর জন্যে প্রতীক্ষারত সাতকড়ি তখন চিন্তা করছিল ধর্ষিতা মেয়েটির কথা। তার মনে কোনো অনুতাপ নেই, কোথা থেকে এই অপকর্মের সাক্ষী জুটে গেল এই ভেবেই সে আশ্চর্য। মাখন ঘরে এলে তার চৈতন্য হয় সেই মেয়েটির চেয়ে মাখন সুন্দরী। সাতকড়ি তাকে আহ্বান করে 'বড়োই অভিমান যে! ডাকছি, তা আসা হচ্ছে না। ঢঙ দেখলাম বিস্তর...।' মাখনের দৃষ্টি দিয়ে ছুটে বেরুচ্ছে 'নিঃশব্দ আর্তনাদ', সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ইতর সাতকড়ি বুঝলো না, 'দু-জনাই মানুষ হইলেও তাহাদের জগৎ বিভিন্ন কোনো অপরিচিত জগতের...।' সাতকড়ি এগিয়ে গেলে মাখন ছুঁতে বারণ করে; বলে, ছুঁলে ভালো হবে না। নিজের কাছে হামেশাই অস্ত্র থাকে বলে তার সন্দেহ হয় মাখনের আঁচলের তলায় তীক্ষ্ণ কোনো অস্ত্র আছে। প্রাণভয়ে দরজা খুলে সাতকড়ি মাকে ডাকে এবং তার সন্দেহের কথা বলে। বউয়ের অমানুষিক একগুঁয়ে আচরণে ক্রোধের তেজে তাহার রক্ত তখনো ফুটিতেছিল', বিরজা তাকে বাড়ির বাহিরে বের করে দিয়ে সদর দরজায় খিল দিয়ে দেয়। সমস্ত সত্তায় যার স্থূল ইতরতা, সেই সাতকড়ি চূড়ান্ত মন্তব্য করে 'জেলই আমার ছিল ভালো।' সুবল বিধবা কাঞ্চনের শিশুকন্যা খুশিকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছিল

('আদিকথার একটি') কাঞ্চনকে সম্ভোগের অভিপ্রায়ে— পরিকল্পনাটি *Lolita*-র বিপরীত। একদিন কাঞ্চনের হাত চেপে ধরায় সুবলের নীচ আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হয়ে গেল। কথাকাটাকাটির মুহূর্তে অন্য একদিন সুবল প্রশ্ন করে, 'কিন্তু আমার অপরাধ কী?' এই প্রশ্ন যেমন দুঃসাহসিক তেমনি নির্লজ্জ। কাঞ্চন 'যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, বহুদিনের সঞ্চিত ইচ্ছা খলতায় ছলনায় পরিপূর্ণ হইয়া শামুকের মতো ধীরে ধীরে বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইয়া হঠাৎ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে।... পাপিষ্ঠের এই লজ্জাহীন সহজ ধৃষ্টতায় তার ক্রোধের অন্ত রহিল না।' অসতর্ক কাঞ্চন একদিন যখন বিস্রস্তবাসা হয়ে বিশ্রামরত তখন সুবল কর্তৃক ধর্ষিতা হলো সে। কাঞ্চনের শরীরে তার পরিণাম ফুটে বেরুলে সমাজপতিদের দ্বারা কাঞ্চন চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত হলো। তাদের চরম রায় হলো 'মাগীতে জাদু না কলে পুরুষ কি অমনিই ভেড়া হয়।' জগদীশ গুপ্তের এই ইতর জগতে ছেলের জন্য নির্বাচিতা পাত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ('পৃষ্ঠে শরলেখা') বাবার তাকে বিয়ে করতে বাধে না।

পুরুষের স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ, সপত্নীর সমস্যার মধ্য দিয়ে মানুষের, বিশেষ করে পুরুষের, এই ইতরতাকে আরো নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত করে দেন জগদীশচন্দ্র। *সুতিনী* উপন্যাসে ইস্কুল মাস্টার দুর্গাপদ'র স্ত্রী রাজবালা। সুখী ছিল তাদের বিবাহিত জীবন। রাজবালার পরপর চারটি ছেলে জন্মে যখন মারা যায় তখন দুর্গাপদর সন্দেহ হয় শ্বশুরবাড়ির পক্ষে কোনো দোষ আছে। শাশুড়ি কালীতারার ধারণা দোষ জামাইয়ের, রাজবালারও ধারণা দুর্গাপদর স্বাস্থ্যহীনতাই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। কিন্তু বান্ধবী সুকেশিনী যখন বলে সন্তান নষ্টের জন্য দায়ী রাজবালার জরায়ুর দোষ, তখন কথাটা তার মনে গেঁথে যায়। সে স্থির করে বোন মধুমালার সঙ্গে স্বামীর বিয়ে দেবে। নিরন্তর ঝগড়ায় উত্যক্ত হয়ে দুর্গাপদ শ্বশুরবাড়িতে খবর দিলে কালীতারা মধুমালাকে নিয়ে জামাইবাড়িতে আসে। রাজবালা মা-কে জানায়, 'আমার শ্বশুরবংশ আমার দোষে নির্বংশ হবে, তা-ই কি আমি গেরস্তের মেয়ে আর বউ হয়ে হতে দিতে পারি। কিন্তু তিনি তা আদৌ শুনবেন না।' কিন্তু ইতিমধ্যে উনির ভাব-পরিবর্তন হয়েছে। এক কৌতুক-মুহূর্তে সম্মিলিত হাসির সময় দুর্গাপদ-মধুমালার দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। 'মধুমালা রক্তিমমুখে চক্ষু নত করিল। বিদ্যুৎবিকাশ যতক্ষণ স্থায়ী হয় ঠিক ততোটুকু সময়ের জন্য দুর্গাপদর মনে হইল, এই নারী তার ভোগ্যা।' দ্বিতীয় বিবাহে তার শিক্ষা ও রুচির বাধা ছিল, 'সেই আবরণে সহসা ছিদ্র দেখা দিয়া শিখার তরল জিহ্বা অনর্গল নির্গত হইতে লাগিল; এবং তাহারই রক্তবর্ণ প্রদীপ্ত আভায় দুর্গাপদর বিনিদ্র রজনী আর ভঙ্গুর তন্দ্রা নিরবচ্ছিন্ন আলোকে সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিল...।' একসঙ্গে তারা যে হেসে উঠেছিল সেই সম্মিলিত হাসিটি জড়াজড়ি করে তার বক্ষকুহরে ক্রীড়া করতে লাগলো। স্বপ্নে সে শোনে শানাইয়ের বাজনা, দেখে আলনায় লাল চেলি ঝুলছে। সকালে তাই বাবা-মা-রাজবালার বিতণ্ডার মধ্যে দুর্গাপদ এসে সহজ সুরে বলতে পারে উনি যা বলছেন তা-ই আপনারা হতে দিন। আমি চিরদিন এই অশান্তি বইতে

পারব না।' নতুন নারীশরীর সম্ভোগের স্থূল ইচ্ছাকে আপাত-অনিচ্ছার অন্তরালে গোপন করে দুর্গাপদ এইভাবে।

ভাবী বৈবাহিকের অতুল ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণাঙ্গী জ্যোতির্ময়ীর সঙ্গে বখে-যাওয়া ছেলে অশোকের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন *মহিষী* উপন্যাসের ব্রজকিশোর। দানপত্র করার ভয় দেখাতেই অশোকের কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসে এবং বিয়েতে সে রাজি হয়। পিতৃবন্ধুর কাছে অশোক যখন জানে তাকে ফাঁকি দিয়ে দানপত্র করার অমূলক ভয় দেখিয়ে বিয়ে দেওয়ানো হয়েছে তখন তার রাগ গিয়ে পড়ে জ্যোতির্ময়ীর উপর। নিজেকে মনে হলো ভীরু, কাপুরুষ নির্বোধ; লোকে নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে। এই নিয়ে যে অশান্তি দেখা দেয় তার পরিণাম হিসেবে জ্যোতির্ময়ী পিত্রালয়ে চলে যায়। প্রকাশ হতে থাকে অশোকের আরো ইতরতা। সে বন্ধুর মাধ্যমে রটিয়ে দেয় জ্যোতির্ময়ীর 'প্রবৃত্তি বড় জঘন্য, ঘেন্না বলে কোনো আবরণ তার নেই। হস্তিনী নারীর সব লক্ষণ তাতে বিদ্যমান।' এই মিথ্যে রটনা অশোকের মা রত্নময়ীর কানে পৌঁছায়; ব্রজকিশোর যখন জানতে চায় এই কথা ছেলেই রটিয়েছে কিনা, তখন অশোক অম্লানবদনে অস্বীকার করে। লোকপরম্পরায় জ্যোতির্ময়ী যখন শোনে, যে-হস্তিনী নারী স্বামীর আয়ুনাশ করে তার সব লক্ষণ তার মধ্যে বিদ্যমান, তখন সে অস্থির হয়ে স্বামীগৃহে ফিরে আসে। এই গুজব রটনার জন্য সেও যখন স্বামীকে সন্দেহ করে তখন অশোকের হিতাহিত জ্ঞানটা এক নিমেষেই বিলুপ্ত হইয়া গেল... জ্যোতির হৃদয় লক্ষ্য করিয়া প্রহরণ নিক্ষেপের দানবীয় উল্লাসে সে অন্ধ হইয়া উঠিল; বলিল,— আমিই কিন্তু সেটা মিথ্যা নয়।' মিথ্যে কলঙ্ক রটিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সব সম্পর্ক তো ছিন্ন হয়ে গেছেই; বস্তুত তাই জোর করে জ্যোতির্ময়ী স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করে। সুন্দরী সপত্নী নন্দরাণীকেও সাদরে অভ্যর্থনা করে নেয়। কয়েকদিনের মধ্যেই জ্যোতি লক্ষ্য করে 'স্বামীর চেহারাই বদলাইয়া গেছে, রং আরো উজ্জ্বল হইয়াছে, চোখে কণ্ঠে ললাটে অধরে পুলক যেন প্রাণ পাইয়া নাচিতেছে... স্বামী তাহার ভোগ্যবস্তু লাভ করিয়াছেন।' যে হৃদয়হীন স্থূল শরীরসর্বস্বতা দুর্গাপদর মধ্যে তার আর এক প্রকাশ অশোকের মধ্যে। কিন্তু স্বামীর ইতরতার সবটুকু পরিচয় পাওয়া তখনও জ্যোতির্ময়ীর ঘটেনি। স্বামীর কাছ থেকে চিরবিদায় নিতে গিয়ে সে দেখে নবদম্পতির মধ্যে কৌতুকালাপ হচ্ছে। হাসতে-হাসতেই জ্যোতিকে দেখে বিস্ময়ের ভান করে অশোক বলে, 'অই! তুমি আছো এখানেই?' এই নির্মম প্রশ্নের আঘাত জ্যোতির সমস্ত রক্তবিন্দু নিঃশেষে গ্রহণ করলো। 'আর চোখের সম্মুখে একটি মুহূর্তের জন্য একটা কালো পর্দা দুলিয়া গেল; ওষ্ঠাধর বিবর্ণ হইয়া একটা থরথর কাঁপুনি বহিয়া গেল।"

চন্দ্রসূর্য যতোদিন গল্পেরও সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেই নীচতার তীব্র রূপায়ণ পাই। শ্বশুরের সম্পত্তির লোভে দীনতারণ পূর্বস্ত্রী ক্ষণপ্রভা থাকতেও শ্যালিকা প্রফুল্লকুমারীকে বিয়ে করে। প্রতিবেশিনীরা যখন দুই বোনের রূপের তুলনা করে তখন ক্ষণপ্রভা মনে-মনে

আহত হয়ে ভাবে— 'এই দেহটার দিকেই সকলের লক্ষ্য— দেহের মাংস, দেহের চর্ম, দেহের বর্ণ!' ক্ষণপ্রভা অনুভব করে স্বামী তার শরীর ভোগ করেছে মাত্র; তাই তার জীবন, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা, এমনকি সন্তানধারণ বৃথা মনে হয়। সে বোঝে ভোগের বর্ধিষ্ণু ক্ষুধার মুখে তার মতো তার বোনও আত্মসমর্পণ করছে। মমতাবশে শাশুড়ি জোর করে ক্ষণপ্রভাকে অনেক দিন পরে দীনতারণের শয়নকক্ষে পাঠালে দীনতারণের হতাশা ক্ষণপ্রভার চোখ এড়ায় না। 'এই শয্যায় প্রবেশ করিতে তার গা ঘিন-ঘিন করিতেছে... অদূরবর্তী ঐ লোকটা কেবল একটা মাংসপিণ্ড— যেমন কদর্য, তেমনি লোলুপ : তার মাংসাশী দেহটা যেন সর্বাঙ্গ দিয়া হা করিয়া আছে...।' ক্ষণপ্রভা চোখ বুজলো, 'কিন্তু দেবতা তার প্রাপ্য অর্ঘ্য আদায় না-করিয়া ছাড়িল না।' একদিন যেকথা মনে হয়েছিল *যোগাযোগ*-এর কুমুর— স্বামীসহবাসও হতে পারে অপবিত্র অশুচি— সেইকথা স্থূল দেহসর্বস্ব স্বামীর সংসর্গে বারবার উপলব্ধি করেছে রাজবালা জ্যোতির্ময়ী এবং ক্ষণপ্রভা।

মানুষের যে অমানুষিক মনুষ্যত্বহীনতা, ইতরতা ও নীচতা জগদীশ গুপ্তের রচনার মূল প্রসঙ্গ তার চরম প্রকাশ আছে *লঘু-গুরু* ও *গতিহারা জাহ্নবী* উপন্যাসে। পতিতা উত্তমকে বিশ্বম্ভর ঘরে এনে তুলেছিল। নতুন মানুষের গন্ধ পেলেই প্রতিবেশিনীরা দল বেঁধে দেখতে আসে, যেন উত্তম নতুন বউ। বাস্তবিকই বউ হওয়ার স্বাদ পেতে চায় উত্তম— হিংস্র পুরুষবুভুক্ষা লুপ্ত হয়ে তার মনে পুরোনো গৃহ-বুভুক্ষা জেগে উঠেছে। কিন্তু পবিত্র জীবনের তৃষ্ণা যতোই তাকে আচ্ছন্ন করুক, অতীত ইতরতা থেকে যতোই সে মুক্তি কামনা করুক, কেউ ভুলতে দেয় না যে সে পতিতা। পাড়ার বালক বালিকারা বিশ্বম্ভরের মেয়ে টুকীর সঙ্গে খেলতে এলে মায়েরা তাদের তুলে নিয়ে যায়। পূর্ণগর্ভা-টুকীর মা হিরণের মৃত্যু হয়েছিল বিশ্বম্ভর ও তার মাতাল বন্ধুদের জন্য চাটের আয়োজনে আপত্তি করে স্বামী কর্তৃক তাড়িত হয়ে পড়ে যাবার ফলে। সেই মর্মান্তিক কাহিনি শুনে উত্তম অশ্রুমোচন করলে বিশ্বম্ভর নির্বিকারভাবে বলে, 'মাছ মরলে বিড়াল কাঁদে, গরু মরলে শকুন।' উত্তম টুকীকে মানুষ করে তুলতে চায়। বিশ্বম্ভর সায় দিয়ে বলে তাদের যৌনসম্ভোগ টুকীর নজরে না পড়াই ভালো, কারণ 'তুমি এসে আছ বলেই যে সে এককালে—।' অনুক্ত ইঙ্গিত উত্তমের বুকে 'ঝড়ের ঝাপটা' মারে। বিশ্বম্ভরের বাড়িতে ইয়ারবন্ধুরা আড্ডা জমালে হিরণ আপত্তি করতো না, বিশ্বম্ভরের ইচ্ছে উত্তমও আড্ডায় যোগ দিক। হিরণ নিজে যোগ দিত কিনা উত্তম সে কথা জিজ্ঞাসা করায় বিশ্বম্ভর নিশ্চিন্তে বলে 'সে ছিল বউমানুষ।' অজ্ঞাতসারে সে উত্তমকে বুঝিয়ে দেয় সে বউ নয়, সে রক্ষিতা বেশ্যামাত্র। উত্তম ইয়ারদের আড্ডায় যোগ দিতে চায় না জেনে আড্ডার অন্যতম সদস্য ক্ষুদিরাম বলে 'এ যে বাবা নিষ্ঠাবতী খাণ্ডারী'। বিশ্বম্ভরের মনের প্রবণতার হদিশ আমাদের জানিয়ে দেন লেখক— নৈতিক মর্যাদাবোধ তার নেই, সূক্ষ্ম সুখদুঃখ অনুভূতির ধার সে ধারে না। এবং মন্তব্য

করেন লেখক, 'পনের আনা মেরুদণ্ডহীন মানুষের এই চরিত্র।' অর্থাৎ বিশ্বম্ভর শুধু ব্যক্তি নয়, সে প্রতিনিধি।

টুকীর গর্ব অন্যদের মা টুকীর মায়ের মতো নয়; তারা লেখাপড়া জানে না; শুধু মুড়ি ভাজে। উত্তম টুকীকে সূচিশিল্প শেখায়, শেখায় লিখতে-পড়তে। শেখায় শুচিতাবোধ। বিশ্বম্ভর কর্তৃত্বের অভিমানে বলে, গেরস্তের ঘরে শুচিতাবোধ থাকা ভালো, কিন্তু উত্তম গেরস্তের বউকেও যেন হার মানাতে পারে। তার কথার ইশারা, উত্তম বউ নয়, বেশ্যা। উত্তম উত্তরে জানায়, 'তোমার তা বারবার মনে করিয়ে দিতে আসার দরকার দেখি নে।... আমার শুচিজ্ঞান নেই, কিন্তু ওকে শেখাতে হবে বলেই বাইরে দেখাই। ঈর্ষা-জর্জর প্রতিবেশিনী মোক্ষর মা টুকীকে কানে-কানে তার মা 'বেশ্যে ছিল' এই খবর জানিয়ে অপরিসীম আহ্লাদ অনুভব করে। টুকী কথাটা উত্তমকে জানাতে উত্তর 'যেন বিষের ঘোরে ঝিমাইতে লাগিল।' আর একই কথা শুনে ইতর বিশ্বম্ভর উত্তমের মুখের দিকে তাকিয়ে হা-হা করে হেসে উঠে বলে, 'তাই বলেছে নাকি! ভারি অন্যায় করেছে তো।' উত্তম পৌরাণিক কথা অনেক জানে, সাধ্বী সীতার পাতিব্রত্যের কাহিনি টুকীকে বলে, সতী কাকে বলে বোঝায়। টুকী কিন্তু জানতে চায় বেশ্যা কথার তাৎপর্য কী? প্রশ্ন শুনে সব গোলমাল হয়ে যায় উত্তমের। সে সামনে বলে, 'সীতা স্বামী বৈ আর কাউকে জানতেন না, অপর লোকের মুখের দিকে চাইতেন না; তাঁকে প্রণাম করো।' টুকীর বিয়ের প্রস্তাব আসে, উত্তম সম্বন্ধে উড়ো চিঠি পেয়ে সে সব সম্বন্ধ ভেঙে যায়। বিশ্বম্ভর রাগ করে বলে, 'তোমার জন্যেই আমার এই বিপদ।' ভুলে যায় উত্তমকে সেই ঘরে এনে তুলেছে, ভুলে যায় উত্তমই টুকীকে মহার্ঘ সুন্দর করে রচনা করেছে। উত্তম টুকীর কাছে ক্ষমা চায়, সে তার সুখ চেয়েছিল কিন্তু সেই হয়ে উঠেছে সুখের অন্তরায়। টুকী কিন্তু নতুন মায়ের সব গ্লানিকর ইতিহাস জেনেও তার প্রতি কৃতজ্ঞ— নতুন মায়ের 'রসমাধুর্যই সারা প্রাণ দিয়া সে অহর্নিশ উপভোগ করিয়াছে; চরিতার্থতায় ধন্য, কৃতজ্ঞতায় অবনত হইয়া গেছে।'

অবশেষে টুকীর বিয়ে স্থির হলো বাহান্ন বছরের বিপত্নীক পরিতোষের সঙ্গে। পাত্রের বয়স বেশি হওয়ায় উত্তম আপত্তি করতে গেলে বিশ্বম্ভর বলে, 'পাপের ফল ভুগতে তো হবেই।' উত্তম আর বাধা দেয় না। পরিতোষ ও তার ত্রিশ বছরের রক্ষিতা সুন্দরী এই বিয়েতে রাজি হয় দেড় হাজার নগদ টাকার লোভে। উপন্যাসের শেষাংশে আর উত্তমকে নয়, টুকীকে আমরা নীচতার আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হতে দেখি। টুকী স্বামীগৃহে এলো, অর্থাৎ ডোমপাড়ায় সুন্দরীর বাড়িতে। রাত্রে পরিতোষের কাছে টুকী জানতে চায়, 'দিদি তোমার কে?' পরিতোষ জড়িতস্বরে জানায়, 'তোমার মা তোমার বাবার যা হয়।' অসহ্য বেদনায় টুকীর বুক যেন ফেটে যায়। বিশম্ভর মেয়েকে দেখতে আসে। উত্তম সম্বন্ধে তার কথাবার্তার ধরনে সুন্দরীর মতো স্থূলরুচির মানুষও বোঝে এই লোকটি প্রণয়িনীর মর্মবাণী কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। সুন্দরী পরিতোষের রক্ষিতা জেনে বিশ্বম্ভরের মনে কোনো

বিকার জন্মায় না, সে অট্টহাস্য করে মাত্র। টুকী ক্রোচেট করতে চাইলে বিদ্রুপ করে, পরিতোষের শৌখিন যৌবনকালের ফোটোয়া মালা দিলে সেই মালাকে যেন হত্যা করে পরিতোষ। টুকীকে আঘাত করাই তার উদ্দেশ্য। এদিকে সুন্দরীর অসহিষ্ণুতা আর ক্লেশের আর সীমা নেই— 'টুকীর রূপ আর যৌবন চোখের সম্মুখেই অনুপভুক্ত হইয়া অস্পৃশ্য আবর্জনার মতো অপরিচয়িত হইতেছে দেখিয়া সুন্দরীর গণিকাচিত্ত যেন নিজেই সর্বস্ব লুণ্ঠনের যন্ত্রণা অহরহ সহ্য করে— তার বিরাম নাই।' টাকা নিয়ে সুন্দরী অচিন্ত্যবাবু বলে এক লম্পটকে উপস্থিত করে টুকীর ঘরে। মরিয়া হয়ে সমস্ত ইতর পরিবেশের বিরুদ্ধে অবসেষে বিদ্রোহ করে টুকী। সে কামুক লম্পটকে বলে, 'এ-কাজ যদি করতে হয়, তবে আপনাকে দেব দেহ, আপনি আমাকে দেবেন টাকা। মাঝখানে ওরা কে?'

ধনী পিতার একমাত্র কন্যা অপরূপা কিশোরীর সঙ্গে বিয়ে হয় অকিঞ্চনের। পিতা জগবন্ধুর অনুচিত প্রশ্রয়ে অকিঞ্চন সংশোধনের বাইরে চলে গিয়েছিল। তার চরিত্রহীনতা গোপন করে তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল জগবন্ধুর বাল্যবন্ধু রাধাবিনোদের কন্যা কিশোরীর সঙ্গে। কিশোরীর আগমনে বাড়ির শ্রী ফিরে গেল। কিন্তু তাঁর রূপগুণ অকিঞ্চনের মনে কোনো রেখাপাত করে না। সে জানতে চায় বাসরঘরে কিশোরীর বাঁপাশে বসে থাকা বউটি কে ছিল? জিজ্ঞাসার ধরনে মনে হয় সে যেন তৃষ্ণাতুর প্রাণে কল্পনায় পরস্ত্রীর অঙ্গ ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে স্পর্শ করছে। বন্ধু বন্ধুস্ত্রী পরম্পরায় কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যায়, বন্ধুস্ত্রী অম্বাকে জেরা করে শাশুড়ি কাত্যায়নীও জেনে যায় কাহিনি। *বারোয়ারি হিতার্থিনী* বাকি তেল শোধ করার অছিলায় জানতে চায় বৃত্তান্ত। কাত্যায়নী তাকে বিমুখ করায় আরো পল্লবিত হয়ে রটে যায় কাহিনি। অকিঞ্চন নাকি অপরার হাত ধরে টেনেছিল, নেহাত নতুন জামাই বলে মার খায় নি সে, অপরা তাকে নাকি খামচে দেয়। রচনা শুনে নির্লজ্জ অকিঞ্চনের ফূর্তি বেড়ে যায়, সে আঁচড়ের দাগ দেখায়। কিশোরীর কাছেও এই রটনার গল্প করতে তার সংকোচ নেই— যেন এক অলৌকিক খ্যাতিতে সে ধর্মপত্নীকে অংশ দিতে চায়। আর এই 'অপবাদের মাঝেই শুধু নামের সূত্রে অকিঞ্চনের দেহ আর মনের পরনারীলোলুপতা এক প্রকার তৃপ্তি লাভ করে...।' কিশোরীকে লেখা চিঠিতে 'তোর অপরা' দেখে পাঁচ মিনিট যেন অসাড় হয়ে থাকে অকিঞ্চন। বাপের বাড়িও যেতে চায় না কিশোরী, ভাবে সেখানে স্বামী না জানি অপরাকে নিয়ে কী কাণ্ড বাধাবে। কিশোরীর সর্বান্তঃকরণ দুস্তর ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

স্বামীর সঙ্গে অবশেষে পিত্রালয়ে গেল কিশোরী। অপরা দেখা না দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিল। শ্বশুরবাড়ির সেবা বা আহার্য গ্রহণে কোনো চক্ষুলজ্জা দেখা গেল না অকিঞ্চনের। পান হাতে নিয়ে সে বললো, 'খুব খেলাম কিন্তু গাণ্ডে পিণ্ডে সইলে হয়! তারপরেই জিজ্ঞাসা করিল-- তোমার সইকে দেখলাম না তো?' কিশোরীর মুখের দীপ্তি নিবে গেল। সাশ্রুমুখে মাকে অনুরোধ করলো তিনি যেন জামাইকে আজই চলে যেতে বলেন। কারণ

না জানতে পেরে মা হেমশশী 'আধুনিকতার স্কন্ধে সমুদয় দোষ চাপাইয়া' দিলেন। কথাটা কানে গিয়েছিল অকিঞ্চনের। ফলে সে এমন পরুষ ব্যবহার করলো যে তুমুল উৎকণ্ঠার মধ্যেও বিনোদবিহারীর মনে হলো এমন ধৃষ্ট কর্কশ কণ্ঠ তিনি জীবনে শোনেন নি। মায়ের শিক্ষামতো কিশোরী স্বামীর পায়ে মাথা ঠুকে ক্ষমা চাইলে 'দেবতা' সন্তুষ্ট হলেন। কিশোরী বারবার বলে কথাটা তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরস্ত্রীর প্রতি স্বামীর লোভের এমন বর্বর প্রকাশ স্বভাবতই তার পক্ষে ক্ষমা করা সম্ভব হয়নি। রাত্রে তাকে ছুঁতে স্বামীকে সে বারণ করে, অশুচি স্বামী সাতকড়ির স্ত্রী ('কলঙ্কিত সম্পক') মাখনবালার মতোই। সকৌতুকে যখন অকিঞ্চন তার অপরাধ জানতে চায়, তখন আনতমুখে কিশোরী বলে, 'আমি তো তোমার যোগ্য নই।' কিন্তু তার যথার্থ উত্তর ছিল, 'তুমি অপবিত্র। আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবার স্পর্ধা তোমার কেন হইবে? অকিঞ্চন বাড়ি ফেরার পর স্ত্রীর চিঠি পেয়ে মন্তব্য করে, 'বিদ্যার্ণব ঠাকুর! চিঠি দ্যাখা হয়েছে!' তিন বাক্যে যে উত্তর গেল তার মধ্যে মা হেমশশীর চোখ হৃদয়ে-হৃদয়ে সংযোগের স্থলটা' খুঁজে পেল না।

কিশোরী পরে শ্বশুরালয়ে ফিরে এলে জগবন্ধু ও কাত্যায়নী আনন্দের আতিশয্য প্রকাশ করে, তাদের বিশ্বাস এই মেয়েই পুত্রকে পঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে পারে। পুত্রের কিন্তু উদ্ধারে কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। আগের মতোই সে বাগদিপাড়ায় নিয়মিত যায়— ওদের হুঁকো টানে না, তাছাড়া কোনো ব্যবধান নেই। অকিঞ্চনের স্বভাবের ইতরতা আরো স্পষ্ট তার সম্বন্ধে বাগদিদের কথায়। 'ল্যাখাপড়া জানা লোকের ধরন বুদ্ধিই আলাদা— খেলাতেই বলুন আর নোচ্চামিতেই বলুন।' অথবা 'চাল তো আবগারি জিনিস লয় যে বাবু তার খোঁজ রাখবেন।' অকিঞ্চন বলে, 'ভালো লাগা নিয়ে কথা।' —নীতি, সুরুচি, মূল্যবোধ এসব তার কাছে অবান্তর। তার ভালো লাগে ভুবনকে। যদিও মায়ের জারজ সন্তান ভুবন, স্বৈরিণী হলে তার স্বামীরও অসম্মতি নেই, কিন্তু ভুবনের স্বভাবের তাতে সায় নেই। বাগদিপাড়ার অন্য মেয়েরা মনে করে দেমাক— 'উল্লিখিত দেমাক সেই পবিত্র অনিচ্ছাটার নাম।' অকিঞ্চনের উৎপাত অসহ্য হওয়ায় একদিন ভুবন কাত্যায়নীর কাছে এসে হাজির হয়ে তাঁকে বাঁচাতে অনুরোধ করে। কাত্যায়নী সব বুঝেও ক্রোধের ভান করে ভুবনকে তাড়াতে চায়, পাছে উপস্থিত কিশোরীর কাছে সব ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু কিশোরী ভুবনের হাত চেপে ধরে সব জানতে চাইলো। শাশুড়িকে বললো, 'কথাটা শুনে যাই। আপনার ঢাকতে যাওয়া বৃথা— আমি বুঝেছি সব; তবু পরের মুখে শুনে নি, কতটা আমায় সইতে হবে।' কিশোরী বিবর্ণ রক্তহীন মুখে ভুবনের মুখে সব শুনলো। বাগদিমেয়েকে ছোঁয়ার জন্য শাশুড়ি স্নানের নির্দেশ দিলে কিশোরী ভাবে, সে উত্তরে বলে, 'জননী, কতোবার কতো জলে স্নান করিলে তোমার পুত্র শুচি হইতে পারে? কিন্তু বলিল না, বলিল না ঘৃণা করিয়া, বাক্যব্যয়ের অরুচিতে।'

পিত্রালয়ে চলে গেল কিশোরী। বধূর উপর রাগ করে জগবন্ধু ছেলের পুনর্বিবাহের

প্রস্তাব দেয়। কিশোরীর বাবা-মাও বিষণ্ণ এই পরিস্থিতিতে। কিশোরীর দাদা গণপতির প্রশ্নের উত্তরে হেমশশীর মুখ দিয়ে সত্য কথা বেরিয়ে যায়— অকিঞ্চন কিশোরীকে যথার্থভাবে গ্রহণই করেনি তো ত্যাগ করবে কি? অনুষ্ঠান সবই হয়েছে কিন্তু 'পুরুষহৃদয়টি মন্ত্রের অর্থ বোঝে নাই।' কিশোরী স্বামীগৃহে ফিরতে রাজি হয় না। অকিঞ্চনের প্রতিবেশী মহলেও 'স্ত্রী কিনা স্বামীকে ত্যাগ করে' এই নিয়ে মহা আলোড়ন। অনেক পরে বৈশাখ মাসে দেশব্যাপী উৎসব ও উল্লাসের মাঝে মরুরিক্ত কিশোরীর মনেও পরিবর্তন আসে। সে চিঠি লেখে অকিঞ্চনকে, জানতে চায় তাকে ত্যাগ করে কেন সে দ্বিতীয় বিবাহের কথা ভাবছে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে জানায়, 'তুমি ভালো না হইলে তোমার কাছে যাইব না।' কিশোরীর শর্তকে কেউ মূল্য দিল না, ভাবলো দাম বাড়ানোর জন্যে কথার কথা মাত্র। অকিঞ্চন জানালো, কিশোরীকে আনবে, নতুন বিয়েও করবে—'সুবিধে পেলে লাভ ছাড়বো এমন বেকুব আমি না।' কিশোরীর চিঠি নিয়ে সে গেল বাগদিপাড়ায় মেয়েমানুষের অভিমানের ভঙ্গুরতা প্রমাণ করতে। চূড়ান্ত ইতরতার সে প্রমাণ দেয় যখন বাগদি মেয়েদের বলে, 'তোরা সব গোপিনী আমার, তিনি আমার রাধা', 'তোরা আমার আটপৌরে ঘর, সে থাকবে পোষাকী।' পুত্রবধূ ফিরে আসতে ইচ্ছুক এই ভেবে তাকে আনতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এলো জগবন্ধু 'গজভুক্ত কপিত্থবৎ অসার একটি বস্তু।' কাত্যায়নীর কিন্তু লক্ষ্মীস্বরূপিণী পুত্রবধূর না ফেরাটাই ভালো লাগলো। কিশোরী 'আসিলে তাহার আসার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা ইতরতার স্তরে সবাইকে নামিয়া যাইতে হইত, যাহার ভিতর হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার শক্তি কাহারও নাই.. বধূ তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে ধারণ করিয়া আছে।' স্ত্রী সম্ভাষণের জন্য পরিপাটী হতে হবে বলে ইতিমধ্যে অকিঞ্চন স্নো কিনেছে। বৈবাহিকগৃহ প্রত্যাগত অসাড়প্রায় জগবন্ধুর কথা শুনে নির্লজ্জ ইতরতায় সে বলে, 'ঐ যে জিভ নড়ছে। আমি ভাবছিলাম, বা অন্তর্জলীই করতে হয়!' কাত্যায়নী চ্যালা কাঠ নিয়ে মারতে গেলে সে স্নো হাতে বেরিয়ে যায় আর মর্মভেদী কান্নায় কাত্যায়নী জগবন্ধুকে বলে, 'ভগবানের দিব্য করে বলছি, আমাদের ছেলে নাই।' একদিকে প্রতিবেশীরা জগবন্ধুকে বলে ঐ রকম ছেলের পুনর্বিবাহ তারা ঘটতে দেবে না, অন্যদিকে বিয়ের আগে জামাই সম্বন্ধে খোঁজখবর না নেওয়ায় বিনোদবিহারী অনুতপ্ত। এমন সময় জানা গেল 'একদিকে হাস্যকর, অন্যদিকে হৃদয়বিদায়ক' সংবাদ,— কিশোরী গর্ভবতী। বিভ্রান্ত কিশোরী ভাবে, এই সন্তান সেই অশেষ কলুষজাত— ইহা শুভ নহে, সার্থক নহে, ঈপ্সিত নহে, ইহা অবাঞ্ছিত এবং বর্জনীয় কলুষ।' জগদীশ গুপ্তের কলুষময় জগতে যৌন আনুগত্য নেই, বিবাহিত সম্পর্কের শুচিতা নেই। স্ত্রী বর্তমানে এই জগতের স্থূলরুচি পুরুষেরা দ্বিতীয় বিবাহে হৃষ্ট লোলুপতার পরিচয় দেয়; নারীধর্ষণ, পরনারী সম্ভোগে তাদের মনের কোনো নৈতিক বা রুচিগত বাধা নেই। তাদের ইতর যৌনক্ষুধার কাছে সম্পর্কজনিত বাধাও বাধা নয়।

হিংস্র পাশবিক নীচতায় ভরা এই জগতের মানুষগুলির ঈর্ষা ও অর্ধগৃধ্নুতা যেন সহজাত ধর্ম। তারা সকলেই *রতি ও বিরতি* উপন্যাসের আয়রনিক সিদ্ধান্তে আস্থাশীল— 'পয়সায় পাপ নাই।' ধনে পাপের ছোঁয়াচ লাগে না— অগ্নি যেমন কোনো মলিনতা গ্রহণ করে না ধনও তেমনি। গোমস্তা মনোমোহন রাখহরির দোকানে আদায়ের টাকা গচ্ছিত রেখে রাত্রিযাপন করে, কারণ রাখহরি বাল্যবন্ধু। সকালে মনোমোহনের চাকর বাবুর খোঁজ করতে এলে রাখহরি জানায় 'সে তো এখানে আসে নি।' এই রাখহরি যথাসময়ে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়ে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করে আর তার ছেলেরা আজ বিস্তৃত ব্যবসায়ের মালিক। *মহিষী* উপন্যাসে ব্রজকিশোর ভাবী বৈবাহিক মন্মথনাথের বাস্তুভিটায় গোলায় খামারে অত্যুজ্জ্বল লক্ষ্মীশ্রী প্রত্যক্ষ করে এমনিই মুগ্ধ হয়ে যায় যে মন্মথনাথের মেয়ের গাত্রবর্ণের খোঁজ নিতে ভুলে যায়। ব্রজকিশোর ফিরে এসে স্ত্রীকে বলে, 'ছেলের আমার রক্তেই জন্ম; টাকার দাম সে জানে। ব্রজকিশোর ছেলেকে নির্ভুলভাবে চিনেছিল। তুলাদণ্ডে একদিকে টাকা, অন্যদিকে সুন্দরী স্ত্রী; তুলাদণ্ড আন্দোলিত হতে হতে 'একদিন টাকার দিকটা ধীরে ধীরে নিচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া একেবরে অনড় হইয়া রহিল— আর তার উঠিবার গতিক দখা গেল না।' তারপর নিজের সম্পত্তি দানপত্র করে দেবার ভয় ব্রজকিশোর দেখাতেই সুশীল বালকের মতো অশোক কৃষ্ণাঙ্গী জ্যোতির্ময়ীকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যায়। জ্যোতির্ময়ীর সন্দেহ হয়েছিল, টাকার লোভেও অন্য পক্ষীয়রা যখন বিয়ে করতে রাজি হয় নি তখন অশোকরা রাজি হলো কেন? 'তোমাদের দয়া দেখে ভয় হয়েছিল যে কামিনী ছোট হয়ে কাঞ্চন বড় হয়ে না ওঠে।' হয়েছিলও বাস্তবিক তাই। জোতির্ময়ী বাপের বাড়ি চলে গেলে অশোক বাপ-মাকে দোষ দেয়, 'তোমরা দেখলে খালি টাকা', সে ভুলে যায় বা মনে রাখতে চায় না যে সে নিজেও খালি টাকাই দেখেছিল। জ্যোতির্ময়ীও একদিন তাকে জানিয়ে দেয় 'তুমি টাকা চেয়েছিলে, পেয়েছো, আমায় চাও না, তাই আমি যাচ্ছি।' নিজের বাবাকেও সে বলে, 'তুমি টাকা ঢালতে পেরেছিলে বলেই আমি পার হয়ে গেছি।' টাকার বিনিময়ে তার বিয়ে না দিলেই ভালো ছিলো। *লঘু-গুরু* উপন্যসে বিশ্বম্ভর প্রতিবেশীদের আলোচনা শুনে ভেবেছিল, বৃদ্ধ বয়সে উত্তম টুকীর বেশ্যাবৃত্তির টাকায় জীবনযাপন করবে ভেবেই হয়তো টুকীর প্রতি তার এতো ভালবাসা। টাকা ও অলঙ্কারে পাঁচহাজার টাকার সঞ্চয় দেখিয়ে উত্তম প্রমাণ করলো টুকীর উপার্জনে তার দরকার নেই। সম্পদ দেখে অভিভূত হয় বিশ্বম্ভর। বলে, 'ব্যবসা বেশ চলতি ছিল, বলতে হবে,' 'পাঁচহাজার টাকার সুদও তো ঢের।' শুনে দুঃখেও হাসি পায় উত্তমের। বিশ্বম্ভর 'কেবল কাঞ্চনকেই নিয়ামক আর কাঞ্চনের বন্ধনকেই সর্বাগ্রগণ্য' মনে করে, ফলে সমাজের বিরূপ সমালোচনার আশঙ্কা আপাতত বিস্মৃত হয়ে যেতে পারে। এখন থেকে সে অবশ্য ভয়ে-ভয়ে থাকে পাছে উত্তম টাকার বাক্স হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। উত্তম বিশ্বম্ভরকে হাড়ে হাড়ে চিনে গেছে বলেই জানায়, যদি সে চলে যায় হাতবাক্সটি যেমন আছে তাকে দিয়ে যাবে। উত্তমের

টাকায় এখন সম্পন্ন দোকানদার বিশ্বম্ভর। উত্তমের কাছে ঋণ পাওয়া যায়, ঋণশোধের জন্য উত্তম তাগিদ দেয় না, সুতরাং যে প্রতিবেশিনীরা পতিতা জেনে উত্তমকে ঘৃণা করে, হয়তো গোপনে ঈর্ষাও করে, তার কাছ থেকে টাকা ধার করতে তাদের বাধে না। কারণ পয়সায় পাপ নেই। টুকীর সঙ্গে প্রৌঢ় বিপত্নীক পরিতোষের বিয়ে হয় সেও দেড়হাজার টাকার লোভে। অনেক অস্ফুট ও নীরব ধস্তাধস্তির পর পরিতোষের রক্ষিতা সুন্দরী সেই টাকা হাতিয়ে নেয়। আর রাত্রে সেই টাকা চুরি গেলে বীভৎসভাবে শোকপ্রকাশ করে সুন্দরী। টাকাই অন্যতম কারণ, যার জন্যে সে টুকীকে গণিকাবৃত্তির পথে ঠেলে দিতে চায়।

'কর্ণধর পানের গমন ও আগমন' গল্পে কর্ণধরের বিধবা মেয়ে দেবদাসী ওরফে পিলে শ্বশুরবাড়ির এক ছেলের সঙ্গে পালিয়েছিল। আশ্রয়দাতা ধনী সমরেন্দ্রের সঙ্গে সে স্বগ্রামে ফিরে এসে অট্টালিকা বানালে তার স্পর্ধায় গ্রামবাসী চটে গিয়েছিল। মেয়েরা ভাবে কী ঘেন্নার কথা, ছেলেরা বলে কী স্পর্ধার কথা। কিন্তু শশীর কথাই ঠিক, 'টাকায় সব হয় মা, টাকায় সব ঢাকা পড়ে।' মহিলারা অন্দরে গিয়ে পিলের কাছে পাঁচ টাকা করে প্রণামী পেল। 'শয্যার দিকে চাহিয়া একটা অপবিত্রতার চিত্র মনে পড়িয়া এবং একটা অপবিত্রতার ছোঁয়াচ লাগিতেছে মনে করিয়া ইঁহাদের মন গুটাইয়া আসিতেছিল— টাকা পাঁচটা প্রণামী পাইয়া সংকুচিত মন তৎক্ষণাৎ বিস্তৃতি লাভ করিল— তাছাড়া লক্ষ্মীর দৃষ্টি লাগিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্যভাবে একটা প্রফুল্লতাও লাভ করিল।' কুড়িয়ে-পাওয়া এক আনা নিয়ে ('চারপয়সায় এক আনা') শশী-কাশীর দরিদ্র সংসারে অশান্তি লেগে যায়। 'সবারই ইচ্ছা হইল যে, আনাটি তুলিয়া নিজের করিয়া লয়— একেবারে নিজের অবিসংবাদিতভাবে নিজের...।' অনুগৃহীত-আশ্রিত গুরুদয়াল হঠাৎ সম্পত্তি পেলে ('গুরুদয়ালের অপরাধ') তার আশ্রয়দাতা এই ভেবে বিরক্ত হয় যে গুরুদয়াল হয়তো আগের মতো অনুগত থাকবে না। জগদীশ গুপ্তের 'পুরাতন ভৃত্য' রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' নয়। সে রাস্তায় যাজক ব্রাহ্মণ মনিবকে ভয় দেখিয়ে তার টাকা নিয়ে পালাতে দ্বিধা করে না। আনুগত্যের মূল্যের চেয়ে সে টাকার মূল্য বেশি বলে জানে। ধনী সদু খাঁ গ্রামবধূর রূপে মুগ্ধ হয়ে ('প্রলয়ঙ্কারী ষষ্ঠী') প্রতারণরা সাহায্যে তাকে ঘরে এনে তুললো। তাকে নিয়ে তুমুল দাঙ্গাও হল। কিন্তু বউ নিজেই আর ধনীর ঘর ছেড়ে দরিদ্র স্বামী জসীমের ঘরে ফিরে যেতে রাজি হলো না। পুত্র ভূতনাথের পর পর দুই স্ত্রীকে কৃষ্ণকান্ত কবিরাজ ('পয়োমুখম্') চিকিৎসার ছলে কলেরার বিষ খাইয়ে হত্যা করে এবং তিনবার তার বিয়ে দিয়ে তিনবার পণ আদায় করে। তৃতীয় বধূ কৃষ্ণাঙ্গী বলে তার বাবার কাছ থেকে মাসে-মাসে জরিমানাও আদায় করে। এই বউ বীণাপাণির হত্যার আয়োজনও সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু সে বেঁচে যায় স্বামী ভূতনাথের সতর্কতায়। বাবাকে ভূতনাথ বলে, 'এ বউটির পরমায়ু আছে, তাই কলেরায় মরলো না বাবা।' ওষুধের নামে বিষ সে বরং বাবাকেই সেবন করতে বলে।

এই শ্বাসরোধকারী অন্ধকার জগতে লুব্ধতার শেষ নেই, সম্পত্তি ও টাকার জন্য সব

কূকর্মটি এখানে স্বাভাবিক। দীনতারণ শ্বশুর স্বরূপচন্দ্রের সম্পত্তির লোভে ('চন্দ্রসূর্য যতোদিন') শ্যালিকা প্রফুল্লকে বিয়ে করে। প্রফুল্লকুমারীর অন্যত্র বিয়ে হলে সেই সম্পত্তির অর্ধেক অংশ বাইরে চলে যেতো। 'স্বরূপচন্দ্রের সম্পত্তি যেন কথা কয়— আর প্রসব করে স্বর্ণ।' বরং স্ত্রী ক্ষণপ্রভা আহত হোক, কিন্তু সম্পত্তি অখণ্ডভাবে তার অধিকারে আসুক। স্বরূপচন্দ্রের কাছেও এই প্রস্তাব খুব লোভনীয় মনে হয়, কারণ তুচ্ছ কন্যাদায়ে তার সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে সুতো ছিঁড়ে দুই অংশ দুই দিকে ঝুলে পড়বে এ চিন্তাও ক্লেশকর। 'স্বরূপচন্দ্র নিজের কবন্ধমূর্তি অক্লেশে কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু ঐটি পারেন না।' তাছাড়া জামাইয়ের সঙ্গে ছোটমেয়ের বিয়েতে পণও দিতে হবে না। 'মায়ের মৃত্যুর দিনে' কেশবলাল ছটফট করছে। মুমূর্ষু মা যে ডাল ভাতের বদলে মূল্যবান ফলের রস খাচ্ছেন সেটা তার ছটফটানির কারণ নয়। এমনকি আসন্ন মাতৃদায়ের খরচ, ভিক্ষুকদেরও খেতে দিতে হবে, পুরোহিতের দাবি মেটাতে হবে, এসবও তার বর্তমান দুশ্চিন্তার কারণ নয়। তার চিন্তার কারণ যা বেঁচে থাকতে ছোটভাই রামলাল এসে পৌঁছুবে কিনা। প্রতিবেশীদের সে বলে, তিনটে চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠানা সত্ত্বেও রামের দেখা নেই। রামকে কিন্তু সে চিঠি লিখেছে যেন বেশি উৎকণ্ঠিত হয়ে চলে না আসে। অথচ মা নাতিকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছে রামকে অচিরে চলে আসার জন্য। পাছে সত্যিই সে চলে আসে এবং মা তাকে নিজের গয়নার অর্ধেক দিয়ে দেয়, এই কেশবের দুশ্চিন্তার মূল কারণ। তার মনে হলো রামের হাতে অর্ধেক অর্পণ করার দুরন্ত অপরাজেয় ইচ্ছায় মায়ের নিঃশ্বাস ফুরোচ্ছে না। 'যে প্রাণ নির্গমোন্মুখ হইয়া আছে, আর নির্গত হইয়া যাইবেই, সে অযথা আবদ্ধ কেন আছে এবং আরো কতোক্ষণ থাকিতে পারে' তা সে কবিরাজের কাছে জানতে চায়। কোনোদিন কবিরাজকে ভিজিট দেয়নি, কিন্তু সেই কবিরাজ যখন বলে, 'আজ রাত কাটে কিনা সন্দেহ', তখন চার টাকা ভিজিট দেবার দুরন্ত অভিলাষ কেশবের মনে জন্মায়। কিন্তু সেই হঠকারিতা সে করে না অবশ্য, বরং চতুর্গুণ বিমর্ষ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। যাইহোক, রামের আগমনের আগেই শেষ নিঃশ্বাস পড়লো মায়ের সব সতর্কতা ব্যর্থ করে বালিশের তলার চাবির সাহায্যে সম্পত্তি স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

যেমন লুব্ধতা তেমনি হিংস্র ঈর্ষা। আঠারো মাস বয়স যখন ঘণ্টুর ('যাহা ঘটিল তাহাই সত্য') তখন তারা মা চন্দ্রিকার দ্বিতীয় পুত্র জন্মালো। জ্যোতিষী কোষ্ঠী প্রস্তুত করে বললেন নবজাতকের আয়ু দীর্ঘ। সকলে জ্যোতিষী নিয়ে ব্যস্ত। পরে উপরে গিয়ে দেখলো 'ছোটো খোকা শুইয়া আছে, কিন্তু তার চক্ষু উন্মীলিত এবং নিষ্পলক— বুকে নিঃশ্বাসের সাড়া নাই আর তার বুকের উপর যে সাদা কাঁথাখানা রহিয়াছে তার উপর ছোটো দুটি পায়ের দাগ— ঠিক ঘণ্টুর পায়ের মাপের।' দীর্ঘ আয়ুর ভবিষ্যবাণীকে যেন ব্যঙ্গ করে এই ঈর্ষাতুর মারাত্মক হত্যা। *সুতিনী* উপন্যাসে নায়িকা রাজবালার ঈর্ষা মনস্তত্ত্বসম্মত এবং হয়তো খানিকটা স্বাভাবিক। সে জোর করে বোন মধুমালার সঙ্গে স্বামী দুর্গাপদর বিয়ে দিয়েছিল। এই বিয়ের

পর শীর্ণ দুর্গাপদর গায়ে মাংস লেগেছে দেখে সে ঈর্ষা বোধ করে। দুর্গাপদ মধুমালার চোরাচাহনি ও গুপ্ত হাসি দেখে তার বুকের মুমুর্ষু আশাটুকু সমাধি লাভ করে। সে বোঝে স্বামীর বিয়ে দিয়ে নিজের পায়ে কুঠার মারা হয়েছে। মধুমালার সন্তান জন্মের পর রাজবালা যখন পঞ্চমবার সন্তানসম্ভবা হয় তখন ভাবে দুর্ভাগা বলেই হয়তো এই সন্তান দীর্ঘজীবী হবে। 'মুমূর্ষুর মুখে ঔষধের মতো এ-ছেলে এখন অনাবশ্যক শূন্যহস্ত আর কৃপাপ্রার্থী আগন্তুকমাত্র।' তার সন্তানের স্থান হবে উচ্ছিষ্ট আসনে, দ্বিতীয় স্থানে। ঈর্ষাকাতরতায় সে প্রার্থনা করে যেন মেয়ে হয়, পরের বাড়ি চলে যাবে। মেয়েকে মধুমালার ছেলের আজ্ঞাবহ ছোটভাই হয়ে জীবন কাটাতে হবে না। হয়তো স্বাভাবিক *গতিহারা জাহ্নবী*-র অকিঞ্চনের বন্ধুদের ঈর্ষা। স্ত্রী কিশোরীর রূপযৌবন বিষয়ে অকিঞ্চন অচেতন, অথচ 'কল্পনায় নিজেকে কিশোরীর মতো সুন্দরীর প্রিয়তমরূপে প্রতিষ্ঠিত' করে ঈর্ষায় তার বন্ধুদের 'অনন্ত গাত্রদাহ ধরিয়া যায়'। এই ঈর্ষার মধ্যেও নিহিত রয়েছে ইতর পরনারীলোলুপতা। কিন্তু কোনো কোনো ঈর্ষায় অস্বাভাবিক বিকারের প্রকাশ। বাপ ছেলের জন্য সুন্দরী পাত্রী মনোনীত করে ('লোকনাথের তামসিকতা') পরে তাকে বাতিল করে দেয় এই ঈর্ষায় যে তার নিজের স্ত্রী যখন সুন্দরী নয়, তখন পুত্রবধূ সুন্দরী হবে কেন? দুই প্রাণের সখীর একজন বিধবা হলে ('ঊর্মিলার মন') ভাগ্যকে মেনে নেয়। কিন্তু বান্ধবীর ছেলের মৃত্যু হলে সহানুভূতির অছিলায় তীব্র বিদ্বেষের বিষ ঢেলে দেয় নিপুণভাবে এবং অনায়াসে। একদিন *লঘু-গুরু* উপন্যাসে টুকীর এক বন্ধু জানলো উত্তমের দেওয়া টুকীর হাতের চুড়িজোড়া পিতলের নয়, সোনার। বান্ধবী জিজ্ঞাসা করে, 'মানুষের ঘাড় ভেঙে কত টাকা এনেছেরে তোর মা? সেই সময় 'হাসিতে হাসিতে একটি নিদারুণ কথা, সাপের বিষদাঁতে যেমন বিষ জমে তেমনি, মোক্ষর মায়ের জিহ্বাগ্রে আসিয়া জমিল— মোক্ষর মা অনুভব করিতে লাগিল, একটি স্থানে সেই সঞ্চিত বিষ ঢালিয়া বিষের ভাণ্ড উজাড় করিতে না পারিলে সে নিজেই যেন বাঁচিবে না।' সুতরাং সে টুকীর কানের কাছে মুখ নিয়ে সেই অপাপবিদ্ধ বালিকাকে জানালো, 'তোর মা বেশ্যে ছিল; গয়না দিয়েছে হাজার লোকে— তোর এ বাবা দেয় নি,' এবং জানিয়ে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলো। অশুচি যে সে শুচিতা সহ্য করতে পারে না, অন্যের পবিত্রতাও তার ঈর্ষার বিষয়। সুন্দরী ঘাগী বেশ্যা, বদ্ধমূলভাবে অপবিত্র— টুকীর সৌকুমার্য ও পবিত্রতা তার পক্ষে অসহনীয়। তাই সুন্দরী যখন মুগ্ধ হয়ে টুকীর নিটোল যৌবনের দিকে চেয়ে থাকে তখন 'কেমন একটা লালসা সুন্দরীর মনে দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল, যেন ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সহস্র লম্পটের বিরংসাদাহ তৃপ্ত করিতে দুহাতে বিলাইয়া দেয়—।' টুকীর কাছে সে যে তেড়িকাটা গোঁফছাটা লম্পট অচিন্ত্যবাবুকে হাজির করেছিল সে শুধু অর্থোপার্জনের জন্য নয়, এই ঈর্ষাতুর দুর্দমনীয় অপ-ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্যেও।

চতুর্দিকব্যাপী ঘন অন্ধকারে আলোগুলোও একে একে নিবে যায়। অপরিমেয়

ইতরতা-নীচতার পরাক্রমে পবিত্রতা সংবেদনশীলতা শুচিশুদ্ধতা অনিবার্যভাবে পরাভব মানে। শুদ্ধান্তঃকরণ মানুষগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে যায়, একা হয়ে যায়; সংসারযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। *মহিষী*-র নায়িকা জ্যোতির্ময়ী স্বামীর ইতরতায় বিপর্যস্ত হয়ে অশোকের পুনর্বিবাহ দিতে শাশুড়িকে অনুরোধ করে। 'জ্যোতির এই কাকুতির মূলে ক্রোধ নাই, অভিমান নাই, পারিবারিক ইষ্টকামনা নাই— সপত্নীসংগ্রহে তার আকুলতা স্বামীর তৃপ্তির জন্যও নহে— সে চায় কেবল নিজেকে যত শীঘ্র সম্ভব বিচ্যুত করিয়া লইতে। মাঝখানে পর্বতের অন্তরাল তুলিয়া স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব সে দুরতিক্রম্য করিয়া তুলিতে চায়।' অপ্রস্তুত অশোককে, ক্রন্দনরত শাশুড়ি রত্নময়ীকে প্রণাম করে সে যখন শেষবারের মতো বিদায় নেয়, তখন সপত্নী নন্দরাণীর ভদ্রতাসূচক 'দিদি, আবার এসো' কথার জবাবও দেয় না। *গতিহারা জাহ্নবী*-র কিশোরী যখন আবিষ্কার করে তার গর্ভে অশেষ কলুষজাত এবং বর্জনীয় কলুষ এক সন্তান এসেছে তখন নীচতার এই চূড়ান্ত বিজয়ে চোখে সে অন্ধকার দেখে। অনুরোধ করে মাকে, মা তাকে কেটে ফেলুক। 'যা খুশি করো তোমরা আমায় নিয়ে— আমি আর পারছি নে।' *নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ* উপন্যাসে স্বামীর কাপুরুষতায় স্তব্ধ হয়ে যায় স্ত্রী প্রফুল্ল। 'আজ পরিবারের কল্যাণের দিকে আদৌ তার লক্ষ্য নাই— যেন নড়িয়া বসিবার সাধ্য নাই, এমনি অসুস্থ নির্জীবের মতো সে একান্তে চুপ করিয়া বসিয়া আছে... তার চোখের পাতায় গাঢ় ছায়া— কোনোদিকেই তার দৃষ্টি নাই— ছেলেটিকে পর্যন্ত সে ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না।' তার স্বামী লুণ্ঠিতা নারীকে রক্ষা করতে যায় নি, প্রফুল্লর ভয় হয় অমন অবস্থাতে শশধর তাকেও ফেলে পালাতো এবং পালাবে। 'আমি শিউরে অবশ হয়ে গেছি— আমার বড় ভয় করছে।' স্ত্রীর তীব্র প্রতিক্রিয়ায় কাপুরুষ শশধরের চোখের সামনেও অসহনীয় অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। *তাতল সৈকতে*-র শরৎ স্বৈরিণী দুর্নাম নিয়ে স্বগ্রাম ছেড়েছিল। রণজিৎকে 'ছেলে' ডেকে, নিয়েছিল তার আশ্রয়। গ্রামসমাজের ইতরতায় যখন সেই পুরোনো অথচ ভিত্তিহীন দুর্নাম আবার তাকে ঘিরে ধরলো, রণজিৎও যখন শরতের চারিত্রিক শুচিতায় সন্দিহান হয়ে পড়লো, তখন নিঃসঙ্গ 'শরৎ মাটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মৃত্যু মানুষের সকল ইন্দ্রিয় ভাঙিয়া আনিয়া ইহার চেয়ে বেশি শুষ্ক অবশ পাণ্ডুর করিতে পারে না।' শেষ পর্যন্ত দেহে মনে পবিত্র 'জিতুর নতুন মা'-কে ইতরতার আক্রমণে পুকুরের জলে ডুবে আত্মঘাতী হতে হলো।

মরে নি, পাগল হয়ে গিয়েছিল ক্ষণপ্রভা ('চন্দ্রসূর্য যতোদিন')। স্বামীর তার প্রতি কোনো ভালোবাসা নেই, নেই হয়তো তার সপত্নী বোন প্রফুল্লর প্রতিও। তাদের স্বামী দিনতারণ নারীমাংসলোলুপ এক কদর্য ইতর মাংসপিণ্ডমাত্র এই বিষয়ে স্বামী-সহবাসের শেষরাত্রে ক্ষণপ্রভা তীব্র-তীক্ষ্ণভাবে নির্মমভাবে সচেতন হয়ে গেল। সেই সচেতনতা নাড়া দিয়ে দিলো তার সমস্ত সত্তার মূলকে। ভোরবেলায় তাকে না শয্যায়, না শয়নকক্ষে, না গৃহের ত্রিসীমায় পাওয়া গেল। একজন তাকে ধরে নিয়ে এলে সকলে মুখ ফেরাতে বাধ্য

হলো। সে তখন উদোম নগ্নিকা এবং 'সম্পূর্ণ উন্মাদ; কিন্তু ছেলেটি বুকে আছেই।' মনুষ্যত্বহীন অ-মানবিকতা শরৎকে করেছে আত্মঘাতী, ক্ষণপ্রভাকে করেছে উন্মাদিনী। *অসাধু সিদ্ধার্থ*-এর নায়ক নটবর অতীতে মুদির দোকানে চাকরি করেছে, বৈষ্ণবীর গর্ভে এক ব্রাহ্মণের জারজপুত্র সে, তার চেয়েও বীভৎস সে ছিল বৃদ্ধ বারাঙ্গনার শয্যাসহচর। সে সিদ্ধার্থ নাম ভাঁড়িয়েছে এবং আজ অজয়াকে সে ভালোবাসে। তার মনে হয় অজয়ার নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার জীবনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া নূতন জগতের সুপ্রসর উদার শ্রীক্ষেত্রে সে মহোল্লাসে ভূমিষ্ঠ হইবে।' সে ভেবেছিল 'জোঁক যেমন শিকরের রক্তে পূর্ণ হইয়া আপনি থামিয়া পড়ে— তার অতীত তার বুকের রক্তে স্থূল ভারাক্রান্ত হইয়া তাহার জীবনের অঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া গেছে।' কিন্তু যায়নি। সে নিরপরাধ, সে অজয়াকে ভালোবেসে পবিত্র মনুষ্যত্ব অর্জন করতে চেয়েছিল— 'প্রাণের অবরুদ্ধ স্পন্দন নিঃশ্বাসে মুক্তিলাভ করিয়া মুক্তির আনন্দে বাতাসে উল্লসিত হতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতীত ইতরতার নিয়তির কাছে তাকে নিরতিশয় পরাভব স্বীকার করতে হয়েছে। *লঘুগুরু*-র শুদ্ধান্তঃকরণ উত্তমের সঙ্গে স্থূলরুচি বিশ্বম্ভরের কোনো মানসিক যোগ ছিলো না। টুকীকে সে নিজের মেয়ের মতো করে, মনোমত করে গড়ে তুলেছিল। সেই টুকী বিয়ের কথা উঠলে সে নিজের নিঃসঙ্গতার কথা ভাবে। 'সে চিরদিনই এত একা যে তাহার তুলনা নাই— কোথাকার কোনো বস্তু এমন নিঃসঙ্গ নহে— সন্ধ্যার একটি নক্ষত্র, মরুর আকাশে একটি পাখি এত নিঃসঙ্গ নহে...।' মায়ের শিক্ষায় কায়মনে পবিত্র যে টুকী সে বিয়ের পর পরিতোষ ও সুন্দরীর কদর্য সংসর্গে নিত্য পীড়িত হয়। অবশেষে সুন্দরীর কৌশল ও প্ররোচনা সত্ত্বেও সে যখন গণিকাবৃত্তি করতে, লম্পটকে দেহদান করতে রাজি হয় না, বরং পবিত্র ক্রোধে তাকে চলে যেতে বলে, তখন খেপে যায় সুন্দরী। টুকীকেই বরং বাড়ি থেকে বের করে দেয় সে। বহিষ্কৃত হয়ে 'সুন্দরীর বাড়ির চৌকাঠ পার হইয়া সে বাহিরে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইল।' *কলঙ্কিত সম্পর্ক*-এ শাশুড়ি যখন মাখনবালাকে বাড়ির বাইরে বের করে সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল তখন মাখনবালাও হয়তো এই রকম ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তমিস্রার মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কলুষবাহিনীর আক্রমণে বিপর্যস্ত পর্যুদস্ত হয়ে, জগদীশ গুপ্ত দেখান, বারবার পরাভূত পবিত্রতা ও শুচিতাকে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে একলা গিয়ে দাঁড়াতে হয়। তার কোনো উপায় দেখেন নি জগদীশ গুপ্ত, কারণ এক ভয়ঙ্কর হতাশাময় পোস্ট-রেনেসাঁস আধুনিক দৃষ্টি দিয়ে তিনি জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। মানুষের সংসারে তিনি দেখেছিলেন নৃশংস অ-মানবিকতা, মনুষ্যহীনতা।